বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামো ও বাণিজ্যনীতি ঃ সামগ্রিক পর্যালোচনা

—এস, এম, আলী আক্কাস

বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতির সফলতা বা বিফলতা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি তথা অর্থনীতির ভবিষ্যতের উপর গভীর প্রভাব রাখে। দেশের দ্রুত স্ফীতমান বাণিজ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে যখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে পুনঃ পুনঃ কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের পরামর্শ সোচ্চার হচ্ছে তখন বাংলাদেশের ব্যবসা–বাণিজ্যের ভিতরের অবস্থা খতিয়ে দেখার এবং অনুসৃত নীতির ফলাফল কাঙ্খিত উদ্দেশ্যের অনুবর্তী কতটা হচ্ছে তা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথমেই একথা বলে রাখা দরকার যে, অর্থনীতির কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের যে পরামর্শ বাংলাদেশ পেয়ে আসছে সেটাকে দেখার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থাকলেও একটা ব্যাপারে মতানৈক্যের অবকাশ থাকা উচিত নয়, তাহলো ''দক্ষতার'' প্রশ্ন। দক্ষতা বলতে এক্ষেত্রে যা বুঝা হয় তাহলো, ''আমদানি–রপ্তানি ফাঁক'' কমিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার এবং আমদানি ও রপ্তানির কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন যাতে দেশ পর্যায়ক্রমে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমাতে পারে এবং রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা ব্যাপকতর করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও পণ্য মূল্যের হ্রাস–বৃদ্ধিজনিত ঝুঁকি কমানো এবং আমদানি কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং শিল্পসহ অন্যান্য খাতের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। তাই বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি আলোচনায় ''দক্ষতা''র প্রশ্নটিকে অবশ্যই একটা প্রেক্ষিত হিসেবে গুরুত্ব সহকারে সামনে আনা দরকার। যা হোক, প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির গতি প্রকৃতি আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের অবস্থা ও কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হবে। সেইসংগে অতীতে অনুসৃত নীতির সংগে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা থাকবে। সর্বশেষে দক্ষতা বিবেচনায় গত এক দশকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে প্রয়াস নেয়া হবে।

১. *বাণিজ্য ঘাটতি*

১.১ গত নয় বছরে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৮০–৮১ সালে যখন এ বাণিজ্য ঘাটতি ২৯৭৯·১ কোটি টাকা ছিল ১৯৮৮–৮৯ তে তা বেড়ে ৬২৭০ কোটি টাকা হয়েছে (সারণী–১ দ্রষ্টব্য)।

সারণী–১
রপ্তানি, আমদানি ও বাণিজ্য ঘাটতি

বছর	রপ্তানি	আমদানি	ঘাটতি	ঘাটতির হার (%)
১৯৭৯–৮০	১১২৪·২	৩৬৭৬·০	–২৫৫১·৮	
১৯৮০–৮১	১১৫৯·৯	৪১৩৯·০	–২৯৭৯·১	১৬·৭
১৯৮১–৮২	১২৫৫·৫	৫১৫৫·০	–৩৮৯৯·৫	৩৭·০
১৯৮২–৮৩	১৬১৬·৩	৫৪৮৮·৯	–৩৮৭২·৭	–০০·০১
১৯৮৩–৮৪	১৯৯০·২	৫৮৬৯·৩	–৩৮৭৯·১	০০·২
১৯৮৪–৮৫	২৪১৫·৫	৬৮৭৭·০	–৪৪৬১·৫	১৫·০
১৯৮৫–৮৬	২৪৩১·৪	৭০৬৫·০	–৪৬৩৩·৬	৩·৯
১৯৮৬–৮৭	৩২৬৩·২	৮০২৬·১	–৪৭৬২·৯	২·৬
১৯৮৭–৮৮	৩৮০৮·১	৯২১৯·০	–৫৪১০·৯	১৩·৬
১৯৮৮–৮৯	৪০৫০·০	১০৩২০·০	–৬২৭০·০	১৫·৯

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও পরিকল্পনা কমিশন। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ, ১৯৮৮–৮৯ থেকে গৃহীত।

একই সময়ে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় সাড়ে তিনগুণের কাছাকাছি। ১৯৮০–৮১ সালে রপ্তানি আয় ছিল ১১৬০ কোটি টাকা। ১৯৮৮–৮৯ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪০৫০ কোটি টাকার মত (প্রাক্কলিত)। অপরপক্ষে একই সময়ের আমদানি ৪১৩৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০৩২০ কোটি টাকা হবে। সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি মোট হিসেবে বাড়লেও আপেক্ষিক অর্থে কমছে। এটা একটা শুভ লক্ষণ। বিষয়টার একটু ব্যাখা প্রয়োজন।

একটা অর্থনীতির অর্থনৈতিক সুকৃতি মাপার অন্যতম মাপকাঠি হলো ঐ দেশ তার আমদানি ব্যয়ের কত অংশ তার রপ্তানি আয় দিয়ে পূরণ করতে পারছে। যদি কোন দেশ তার আমদানি ব্যয়ের পুরোটাই রপ্তানি আয় দ্বারা মিটাতে পারে তাহলে ঐ দেশকে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির দেশ বলা যায়। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ তার বহির্বাণিজ্যে তেমন ভাল ফল দেখাতে পারছে না। তবে অবস্থার আপেক্ষিক উন্নতি ঘটেছে এই অর্থে যে ১৯৭৯–৮০ সালে বাংলাদেশ যেখানে তার আমদানি ব্যয়ের শতকরা ৩১ ভাগ তার রপ্তানি আয় থকে মিটাতে পারতো ১৯৮৮–৮৯ অর্থ বছরে ঐ হার ৩৯ ভাগ–এ উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছর ১% হারে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক উন্নতি হচ্ছে (সারণী–২ দ্রষ্টব্য)। তবে এই উন্নতির উল্লেখযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা এ কারণে যে, বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বরাবরই তার রপ্তানি আয়ের চাইতে বেশী। ১৯৭৯–৮০ সালে দ্বিগুণেরও বেশী ছিল। ১৯৮৭–৮৮ সালে তা দ্বিগুণের নীচে অবস্থান করছিল। তাই

বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ যখন তার রপ্তানি আয়ের নিজস্ব পরিসীমা অতিক্রম করে প্রায় দ্বিগুনের কাছাকাছি তখনও বাৎসরিক মাত্র ১% হারে এর আপেক্ষিক উন্নতি তেমন কোন গুরুত্ব বহণ করে না। বাণিজ্য ঘাটতি জনিত সমস্যার মৌলিক কোন উন্নতি সাধন করতে হলে প্রথমেই যে পদক্ষেপ নেয়া দরকার তা হলো বাণিজ্য ঘাটতির প্রবৃদ্ধির হার ঠেকানো অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেয়ার বছরে কমপক্ষে বাণিজ্য ঘাটতি পূর্বের তুলনায় না বাড়ানো এবং পরবর্তী বছরগুলোতে একটা গ্রহণযোগ্য হারে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে আনতে শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা।

বাণিজ্য ঘাটতি প্রবৃদ্ধির হার শূন্যের কোটায় রাখার একটা তুলনামূলকভাবে সার্থক প্রচেষ্টা ছিল ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে। ১৯৮৪-৮৫ তে হঠাৎ করে এ হার ১৫% হলেও পরবর্তী দু'বছরে তিন বা চার ভাগের মধ্যে সীমিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, গত দু'বছরে (১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯) বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধির হার আবার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১৩.৬% ও ১৫.৯% এ দাড়ায়।

সারণী-২

বাংলাদেশের আমদানি মূল্য পরিশোধ ক্ষমতা

বছর	রপ্তানি	আমদানি	আমদানি-রপ্তানি অনুপাত	রপ্তানি-আমদানি অনুপাত
	(১)	(২)	(৩)=(২)÷(১)	(৪)=(১)÷(২)×১০০
১৯৭৯-৮০	১১২৪.২	৩৬৭৬.০	৩.৩	৩১
১৯৮০-৮১	১১৫৯.৯	৪১৩৯.০	৩.৬	২৮
১৯৮১-৮২	১২৫৫.৫	৫১৫৫.০	৪.১	২৪
১৯৮২-৮৩	১৬১৬.৩	৫৪৮৮.৯	৩.৪	২৯
১৯৮৩-৮৪	১৯৯০.২	৫৮৬৯.৩	২.৯	৩৪
১৯৮৪-৮৫	২৪১৫.৫	৬৮৭৭.০	২.৮	৩৫
১৯৮৫-৮৬	২৪৩১.৪	৭০৬৫.০	২.৯	৩৪
১৯৮৬-৮৭	৩২৬৩.২	৮০২৬.১	২.৫	৪১
১৯৮৭-৮৮	৩৮০৮.১	৯২১৯.০	২.৪	৪১
১৯৮৮-৮৯	৪০৫০.০	১০৩২০.০	২.৫	৩৯

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও পরিকল্পনা কমিশন পরিবেশিত এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৮-৮৯ তে উদ্ধৃত উপাত্তের পরিবর্ধিত রূপ

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

তাই বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে যে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ বা প্রচেষ্টা ছিল গত দু'বছরে তাও যেন অপসারিত হয়েছে। অবশ্য গত দু'বছরের বাণিজ্য ঘটতির চরম স্ফীতির অন্যতম কারণ এই যে, উক্ত সময়ে দেশের খরা ও বন্যা জনিত খাদ্য ঘাটতির কারণে বর্ধিত পরিমাণে খাদ্য আমদানি করতে হয়।

২. বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য

২.১ *রপ্তানি বাণিজ্য*

গত দশ বছরে রপ্তানি আয় প্রকৃত অর্থে গড়ে শতকরা ৭·৩ ভাগ হারে বেড়েছে। (সারণী–৩)। আমদানির ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধি হার ছিল শতকরা ১·৪ ভাগ (সারণী–৪), রপ্তানি বৃদ্ধির গড় হার ৭·৩ ভাগ হলেও ১৯৮০–৮১ সালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার ধনাত্মক ছিল। ১৯৮২–৮৩–তে তা ২২٪ ছিল। ১৯৮৩–৮৪ ও ১৯৮৪–৮৫ সালে এ প্রবৃদ্ধি হার কমে গড়ে দাড়ায় ৫٪ এ। অবশ্য এর পরবর্তী বছরে আবার রপ্তানি বৃদ্ধি হার ঋণাত্মক হয়। ১৯৮৬–৮৭ ও ১৯৮৭–৮৮ অর্থ বছরে এ হার ছিল যথাক্রমে ১৯·৬ ভাগ ও ৬·১ ভাগ। রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি হারের উত্থান–পতনের তিনটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। এক, দ্বিতীয় তেল অস্ত্র প্রয়োগোত্তর উন্নত বিশ্বের মন্দা কাটিয়ে উঠা এবং ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতির পুনরুদ্ধার ; দুই, তৃতীয় বিশ্বের প্রাথমিক পণ্যের মূল্যের হ্রাস–বৃদ্ধি ; তিন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কয়েকটি অপ্রচলিত পণ্যের (হিমায়িত খাদ্য, পোশাক শিল্প) হঠাৎ প্রসার।

রপ্তানি বাণিজ্যের সার্বিক অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক হলেও কয়েকটি প্রচলিত পণ্যের (যেমন পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা) রপ্তানি আয় ১৯৮৪–৮৫–র পর থেকে বেশ কমে গেছে (সারণী–৫)। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এসব পণ্যের দাম গত তিন বছরে দ্রুত পড়ে গেছে (সারণী–৬)। তবে সন্তোষের ব্যাপার এই যে, ১৯৮৪–৮৫ থেকে প্রধান প্রধান দাম কমা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সামগ্রিক রপ্তানি আয় বেশ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চায়ের মূল্যের উত্থান–পতন হলেও চামড়া এবং হিমায়িত খাদ্যের দাম ও রপ্তানি আয় উভয়েই গত দশ বছরে উত্তরোত্তর বেড়েছে (সারণী–৬ দ্রষ্টব্য)। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে এ দু'টো পণ্যের এখন উত্তরোত্তর চাহিদা যে বেড়েছে তা প্রতিয়মান হয়।

সারণী–৩
বাংলাদেশের রপ্তানি পরিস্থিতি

	রপ্তানি, বর্তমান মূল্যে	জাতীয় আয় ডিফ্লেটর	মূল্য পরিশীলিত রপ্তানি (প্রকৃত রপ্তানি)	রপ্তানি প্রবৃদ্ধি	গড় রপ্তানি হার ১৯৮০–৮৮
১৯৮০–৮১	১১৫৯·৯	১·০০০০	১১৫৯·৯		
১৯৮১–৮২	১২৫৫·৫	১·১২৭৫	১১১৩·৫	–৪·০	
১৯৮২–৮৩	১৬১৬·৩	১·১৪৩৭	১৩৬৫·৫	২২·৬	
১৯৮৩–৮৪	১৯৯০·২	১·৩৭৭৮	১৪৪৪·৫	৫·৮	
১৯৮৪–৮৫	২০১৫·৫	১·৫৮২৯	১৫২৬·০	৫·৬	৭·৩
১৯৮৫–৮৬	২৪৩১·৪	১·৬৭৫২	১৪৫১·৪	–৪·৯	
১৯৮৬–৮৭	৩২৬৩·২	১·৮৮০০	১৭৩৫·৭	১৯·৬	
১৯৮৭–৮৮	৩৮০৮·১	২·০৬৭৮	১৮৪১·৬	৬·১	
১৯৮৮–৮৯	৪০৫০·০				

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৮–৮৯ পরিবেশিত উপাত্তের ভিত্তিতে

সারণী – ৪
বাংলাদেশের আমদানি পরিস্থিতি

	আমদানি, বর্তমান মূল্যে	জাতীয় আয় ডিফ্লেটর	মূল্য পরিশীলিত আমদানি (প্রকৃত আমদানি)	আমদানি প্রবৃদ্ধি	গড় আমদানি হার ১৯৮০–৮৮
১৯৮০–৮১	৪১৩৯·০	১·০০০০	৪১৩৯·০		
১৯৮১–৮২	৫১৫৫·০	১·১২৭৫	৪৫৭২·১	১০·৫	
১৯৮২–৮৩	৫৪৮৮·৯	১·১৮৩৭	৪৬৩৭·১	১·৪	
১৯৮৩–৮৪	৫৮৬৯·৩	১·৩৭৭৮	৪২৫৯·৯	–৮·৫	
১৯৮৪–৮৫	৬৮৭৭·০	১·৫৮২৯	৪৩৪৪·৬	২·৪	১·৪
১৯৮৫–৮৬	৭০৬৫·০	১·৬৭৫২	৪২১৭·৪	–২·৯	
১৯৮৬–৮৭	৮০২৬·১	১·৮৮০০	৪২৬৯·২	১·২	
১৯৮৭–৮৮	৯২১৯·০	২·০৬৭৮	৪৪৫৮·৪	৫·৯	
১৯৮৮–৮৯	১০৩২০·০				

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৮–৮৯ পরিবেশিত উপাত্তের ভিত্তিতে

সারণী–৫

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য

(কোটি টাকায়)

বছর	পাটজাত দ্রব্য	কাঁচা পাট	চা	চামড়া	হিমায়িত খাদ্য	পোশাক	অন্যান্য	মোট
১৯৭৯–৮০	৬০৬·৭	২২২·১	৫১·০	১০১·৫	৫৭·৩	১·০	৮৪·৬	১১২৪·২
১৯৮০–৮১	৫৯৯·০	১৯৪·৩	৬৬·৫	৯২·৬	৬৫·৩	৫·৩	১৩৭·০	১১৫৯·৯
১৯৮১–৮২	৫৮৪·০	২০৩·৮	৭৬·০	১২৬·৪	১০৫·৮	১৪·৩	১৪৫·৪	১২৫৫·৫
১৯৮২–৮৩	৭৫২·৬	২৫৮·৫	১০৯·৬	১৩৭·৬	১৬৯·৬	২৫·৫	১৬২·৮	১৬১৬·৩
১৯৮৩–৮৪	৮৭৬·০	২৮৭·৬	১৬৯·১	২০৯·২	১৮৮·৯	৭৭·৫	১৮১·৮	১৯৯০·২
১৯৮৪–৮৫	১০০৭·৬	৩৮৯·৮	১৫৭·৭	১৮০·৪	২২৪·৫	৩০০·৪	১৫৫·০	২৪১৫·৫
১৯৮৫–৮৬	৮৭০·০	৩৬৭·৭	৯৭·৩	১৮০·২	৩৩৫·৯	৩৯০·২	১৯০·০	২৪৩১·৪
১৯৮৬–৮৭	৯১৬·৪	৩১৬·১	৯০·১	৪০৯·৭	৪০৭·৭	৯০৭·৭	২১৫·৫	৩২৬৩·২
১৯৮৭–৮৮	৯৩৫·৪	২৪৯·১	১২০·৫	৪৫৫·২	৪৩১·৯	১৩৪২·১	২৭২·৯	৩৮০৮·১
১৯৮৮–৮৯	৯৩০·০	২৯৫·০	১৪৩·০	৪২৯·০	৫১৮·০	১৩৮১·০	৩৫৪·০	৪০৫০·০

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সারণী–৬

রপ্তানি মূল্য সূচক

(ভিত্তি ঃ ১৯৭৬–৭৭ =১০০)

	১৯৮১–৮২	১৯৮২–৮৩	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮
সাধারণ	১৫১	১৭৩	২০৮	৩০১	২৫৭	২৩২	২৫৯
কাঁচা পাট	১৪২	১৪৯	১৭৭	৩২২	২৪২	২০১	২৩১
পাটজাত দ্রব্য	১৭৮	২১১	২৩৭	৩৩৪	২৯৬	২৭৩	২৮৯
চামড়া	৯৭	১০৫	১৪২	১৫৩	১৫৩	১৬৯	২৩৯
চা	১২০	১৭৭	২৭৬	৩৪৩	২৮৯	২২৪	২১৫
হিমায়িত খাদ্য	১৪৬	১৭৭	২০১	২১৮	২২৬	২৪২	২৮৬

উৎস ঃ বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

তৈরী পোশাকের রপ্তানি আয় গত নয় বছরে অতি দ্রুতগতিতে বেড়েছে। ১৯৭৯–৮০ এর মাত্র এক কোটি টাকা থেকে এর আয় বেড়ে ১৯৮৪–৮৫ তে তিনশত কোটি এবং গত বছরে (১৯৮৭–৮৮সালে) ১২৯৬ কোটি টাকা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামোর বেশ একটা পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এ পরিবর্তন কতটা সন্তোষজনক এ ব্যাপারে প্রশ্ন থাকলেও পরিবর্তন যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ পরিবর্তনের গুণগত মান অবশ্যই বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

১৯৭৯–৮০ সালে ৮টি প্রধান রপ্তানি পণ্যসহ অন্যান্য পণ্যের কাঠামো নিম্নরূপ ছিল। পাটজাত দ্রব্য ৫৪%, কাঁচা পাট ২০%, চা ৫%, চামড়া ৯%, হিমায়িত খাদ্য ৫% ও অন্যান্য পণ্য ৮% (সারণী–৭)। এ বছরে তৈরী পোশাকের অস্তিত্ব রপ্তানি কাঠামোয় প্রায় অস্তিত্বহীন (০·১%)। গত নয় বছরে এ কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অর্থাৎ রপ্তানি আয়ে প্রচলিত পণ্যগুলোর বিশেষ করে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অবদান ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। চা এবং চামড়ার অবস্থানের তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি। ১৯৮৭–৮৮ সালে রপ্তানি কাঠামোর নতুন রূপান্তরিত অবস্থা নিম্নরূপ ঃ পাটজাত দ্রব্য ২৪%, কাঁচা পাট ৮%, চা ৩%, চামড়া ১১%, হিমায়িত খাদ্য ১০%, তৈরী পোশাক ৩৫% এবং অন্যান্য ৮%। ১৯৭৯–৮০ এবং ১৯৮৭–৮৮ এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়, পাটজাত দ্রব্য ও কাঁচা পাটের অবদান যথাক্রমে ৫৪% ও ২০% থেকে হ্রাস পেয়ে ২৪% ও ৮% এ এসে দাঁড়িয়েছে। চায়ের অবদান ৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ৩% হয়েছে। চামড়ার অবদান ১৯৭৯–৮০ এর ৯% থেকে ১৯৮৭–৮৮ তে ১১% এ উন্নীত হয়েছে। উক্ত সময়ে হিমায়িত খাদ্য ও তৈরী পোশাকের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যথাক্রমে ৫% ও ০·১% থেকে বেড়ে ১০% ও ৩৫% হয়েছে। বাদ বাকী পণ্যসমূহের অবদান পরিবর্তিত না হয়ে ৮%–এই অবস্থান করছে। (চিত্র–১ দ্রষ্টব্য)

উপরোক্ত কাঠামোগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রচলিত ৪টি পণ্যের (পাটজাত দ্রব্য, কাঁচা পাট, চা ও চামড়া) মধ্যে প্রথম তিনটির অবদান রপ্তানি আয় কাঠামোয় ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আর এই হ্রাসের স্থানান্তর ঘটেছে তৈরী পোশাক ও হিমায়িত পণ্যের অবদানের ব্যাপক বৃদ্ধির মাধ্যমে। আরও সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রচলিত রপ্তানি পণ্য পাটজাত দ্রব্য, কাঁচা পাট ও চায়ের অবদান রপ্তানি কাঠামোতে যতটা কমেছে তার প্রায় পুরোটাই স্থানান্তর ঘটেছে তৈরী পোশাকের অবদান বৃদ্ধির মাধ্যমে।

সারণী–৭

বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামো

(শতকরা হারে)

	পাটজাত দ্রব্য	কাঁচা পাট	চা	চামড়া	হিমায়িত খাদ্য	তৈরী পোশাক	অন্যান্য	মোট
১৯৭৯–৮০	৫৪	২০	৫	৯	৫	০	৮	১০০
১৯৮০–৮১	৫২	১৭	৬	৮	৬	০	১২	১০০
১৯৮১–৮২	৪৭	১৬	৬	১০	৮	১	১২	১০০
১৯৮২–৮৩	৪৭	১৬	৭	৯	১০	২	১০	১০০
১৯৮৩–৮৪	৪৪	১৪	৮	১১	৯	৪	৯	১০০
১৯৮৪–৮৫	৪২	১৬	৭	৭	৯	১২	৬	১০০
১৯৮৫–৮৬	৩৬	১৫	৪	৭	১৪	১৬	৪	১০০
১৯৮৬–৮৭	২৮	১০	৩	১৩	১২	২৮	৭	১০০
১৯৮৭–৮৮	২৫	৭	৩	১২	১১	৩৫	৭	১০০
১৯৮৮–৮৯	২৩	৭	৪	১১	১৩	৩৪	৯	১০০

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, রূপান্তরিত।

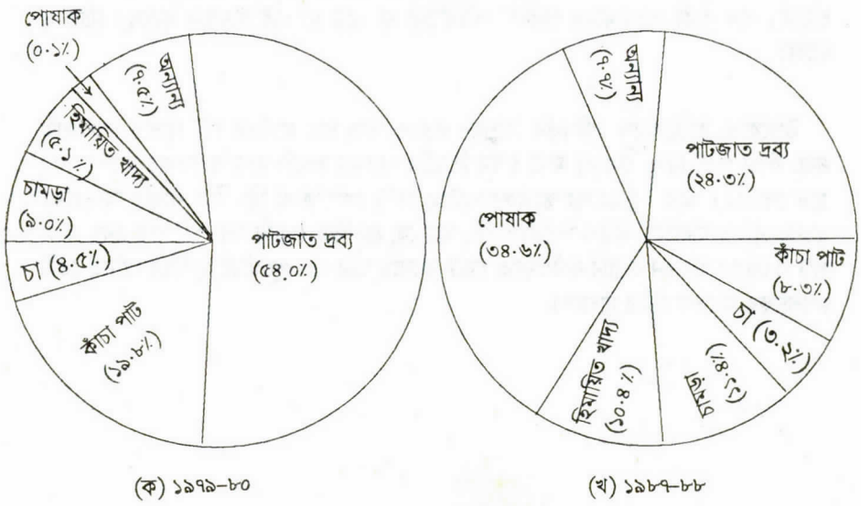

(ক) ১৯৭৯–৮০ (খ) ১৯৮৭–৮৮

চিত্র–১ ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামো

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের কাঠামোগত পরিবর্তনের আর একটা বিশেষ দিক হলো সরকার ও রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প খাতের রপ্তানি মোট রপ্তানির তুলনায় হ্রাস পেয়ে আসছে বর্ষ পরম্পরায়। অপরপক্ষে বেসরকারী খাত রপ্তানি বাণিজ্যের সিংহ ভাগ দখল করছে উত্তরোত্তর।

১৯৮২–৮৩ সালে সরকার মোট রপ্তানির ৫% রপ্তানি করেছে। অথচ ১৯৮৭–৮৮ সালে এ হার মাত্র ১%। রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পের রপ্তানি একই সময়ে ৪৩% থেকে ১০% এ নেমে এসেছে। অপরপক্ষে বেসরকারী খাত ১৯৮২–৮৩ সালে মোট রপ্তানি আয়ের যেখানে মাত্র ৫২% রপ্তানি করতো, ১৯৮৭–৮৮ সালের শেষভাগে এসে তা দাঁড়ায় ৮৯% এ। (সারণী–৮ দ্রষ্টব্য)।

সারণী—৮

প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে বাংলাদেশের রপ্তানি

(শতকরা হারে)

	১৯৮২–৮৩	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮
সরকার	৫	২	৩	১	১	১
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	৪৩	২৪	২৫	২০	১৩	১০
টি, সি, বি	০	০	০	০	০	০
বেসরকারী	৫২	৭৪	৭২	৭৮	৮৫	৮৯
অন্যান্য	০	০	০	০	০	০
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত উপাত্ত থেকে রূপান্তরিত।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, রপ্তানি কাঠামোর রূপান্তর বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সুখকর কিনা। প্রায়শঃই শোনা যায়, আমরা প্রচলিত পণ্যের উপর নির্ভরতা কমাতে পেরেছি। এটা সুখের বিষয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে রপ্তানি বাণিজ্যে প্রচলিত পণ্যসমূহের উপর আমরা নির্ভরতা যতটা কমাতে পেরেছি তার প্রায় সমপরিমাণ নির্ভরতা স্থাপিত হয়েছে মাত্র কতিপয় দেশের কোটার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা ঝুঁকিপূর্ণ তৈরী পোশাক রপ্তানির উপর। বলা হয়, আমাদের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা এখন শতাধিক এবং এরূপ বলার মধ্যে আত্মতুষ্টির ভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রূঢ় হলেও বাস্তব যে, রপ্তানি কাঠামোয় হিমায়িত খাদ্য ও তৈরী পোশাক ছাড়া অন্যান্য অপ্রচলিত পণ্যের অবদান সেই নয় বছরের আগের অবস্থায়ই রয়ে গেছে (৮%) (সারণী–৬)। এমতাবস্থায় রপ্তানি পণ্য থেকে আয় বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি কমানোর প্রচেষ্টা আরও জোরদার করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

LIBRARY

তৈরী পোশাক একটি বিকাশমুখী শিল্প নিঃসন্দেহে। এর নাটকীয় উত্থানে খুশী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এর অগ্রগতি অব্যাহতও রাখতে হবে। তবে ঝুঁকি কমানোর জন্য এ পণ্যটির আমদানিকারক দেশের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে এবং এভাবেই মুখ থুবড়ে পড়ার আশংকা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

২.২ *আমদানি বাণিজ্য*

এ কথা ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির হার আমদানি বৃদ্ধি হারের চাইতে বেশী। কিন্তু আমদানির পরিমাণ রপ্তানি আয়ের তিন গুণ বিধায় বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ স্ফীত হচ্ছে প্রতিবারই। ফলে বর্ধিত রপ্তানি আয় চলতি লেনদেন হিসেবের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছে না। ১৯৮০–৮১ অর্থ বছরে ৪১৩৯কোটি টাকার পণ্য আমদানি হয়। ঐ বছরের মূল্যে ১৯৮৭–৮৮ অর্থ বছরে আমদানি বেড়ে হয় ৪৪৫৮ কোটি টাকা। গড় প্রবৃদ্ধির হার ১·৪%। গত আট বছরের মধ্যে ১৯৮১–৮২ সালে আমদানি বৃদ্ধির হার পরিমাণগত দিক দিয়ে সর্বাধিক ছিল (১০·৫%)। পরবর্তী পাঁচ বছরে এই হার গড় পড়তা ২% এর কম ছিল। কিন্তু ১৯৮৭–৮৮ তে বাড়ে ৫·৯%।

বাংলাদেশের অবনতিশীল বাণিজ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে আমদানি প্রবৃদ্ধির এই হার দু'টি অবস্থা নির্দেশ করে। এক, রপ্তানি বৃদ্ধি হারের তুলনায় আমদানি বৃদ্ধি হারের এই মৃদুতা কেন? এটা কি পরিকল্পিত আমদানি নিয়ন্ত্রনের ফল অথবা আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার অভাবজনিত কারণে। দুই, এটা দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বিশেষ করে রপ্তানির জন্য উৎপাদনকে বাধাগ্রস্থ করছে কিনা? কারণ বাংলাদেশের উৎপাদন কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিষয়টিকে একটু গভীরভাবে দেখতে হলে আমদানি কাঠামো পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

পর্যালোচনার সুবিধার্থে আমদানিকৃত সব পণ্যকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ ভোগ্যপণ্য, ভোগ্যপণ্য তৈরীর উপকরণ, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও মূলধনী যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের জন্য উপকরণাদি (খুচরা যন্ত্রাংশসহ)। ১৯৮২–৮৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের আমদানি কাঠামোয় উপরোক্ত চার শ্রেণীর পণ্যের অবস্থান নিম্নরূপ ঃ ভোগ্যপণ্য ২৬·৩%, ভোগ্যপণ্য তৈরীর উপকরণ ৩৪·৬%, মূলধনী যন্ত্রপাতি ২৯·৩% এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপকরণ ৯·৮% (সারণী–৯)। এ কাঠামোর একটা গুণগত পরিবর্তন এসেছে বর্ষ পরম্পরায়। ১৯৮৭–৮৮ সালে এ কাঠামোর পরিবর্তিত রূপ হলো নিম্নরূপ ঃ ভোগ্যপণ্য ৩৭·২%, ভোগ্যপণ্য তৈরী উপকরণ ৩৫%, মূলধনী যন্ত্রপাতি ১০·৬% এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপকরণ ১৭·২%। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভোগ্যপণ্যের অবস্থান গত ৫ বছরে প্রায় ১১% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭·২% –এ উন্নীত হয়েছে, ভোগ্যপণ্য তৈরীর উপকরণাদিও কিঞ্চিৎ বেড়েছে (০·৪%)। মূলধনী যন্ত্রপাতির অবস্থান আমদানি কাঠামোয় ২৯·৩% থেকে প্রায় ১৯ ভাগ কমে ১০·৬ –এ দাড়িয়েছে। কিন্তু অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হলেও মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহার সামগ্রী অবদান উত্তরোত্তর বেড়ে ১৯৮৬–৮৭ সালে ২১·৫% উঠেছিল, সেটা কমে

১৯৮৭–৮৮ সালে ১৭·২% হয়েছে। উপরোক্ত কাঠামোগত পরিবর্তনের সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় এই যে, ভোগ্যপণ্য ও ভোগ্যপণ্য তৈরীর উপাদান এই দু'য়েরই হার আমদানি কাঠামোয় বেড়েছে। অপর দিকে মূলধন যন্ত্রপাতির আমদানির হার পড়ে এসেছে উত্তরোত্তর, কিন্তু মূলধনী যন্ত্রপাতির উপকরণাদির স্থান উন্নীত হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

এমতাবস্থায় এরূপ উপসংহার টানা কি সঙ্গত যে, আমদানি প্রক্রিয়ায় গত পাঁচ–ছয় বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দেশজ উৎপাদন প্রক্রিয়া চাঙ্গা করার চাইতে ভোগ প্রবণতা শক্তিশালী হয়েছে? বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার জন্য আমদানি কাঠামোধীনে বর্ণিত বিভক্তিকরণ আরো সম্প্রসারিত করে অর্থনৈতিক শ্রেণীভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে আমরা আমদানিকৃত সমুদয় পণ্যকে নিম্নোক্তভাবে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করে নামকরণ করতে পারি ঃ

সারণী —৯

বাংলাদেশের আমদানি কাঠামো

(শতকরা হারে)

	১৯৮২–৮৩	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮
ভোগ্যপণ্য	২৬·৩	২৬·৮	৩২·৫	৩২·৮	৩২·৩	৩৭·২
ভোগ্যপণ্য তৈরীর উপকরণ	৩৪·৬	৩৬·৬	৩৮·৪	৩৬·১	৩২·৮	৩৫
মূলধনী যন্ত্রপাতি	২৯·৩	২৬·৬	১২·৫	১২·৩	১৩·৪	১০·৬
মূলধনী যন্ত্রপাতি উপকরণ	৯·৮	১০	১৬·৬	১৮·৮	২১·৫	১৭·২
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিবেশিত উপাও থেকে রূপান্তরিত।

(১) খাদ্য ও পানীয়, (২) শিল্পজাত সরবরাহ (সুতা, কাপড়, সার, সিমেন্ট), (৩) জ্বালানী ও লুব্রিকান্ট (৪) কলকব্জা ও মূলধন যন্ত্রপাতি (৫) পরিবহণ সরঞ্জামাদি এবং (৬) ভোগ্যপণ্য। (সারণী–১০ দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য সময়ে (১৯৮২–৮৩ থেকে ১৯৮৮–৮৯) খাদ্য ও পানীয় সংক্রান্ত আমদানির বেশ উত্থান–পতন হয়েছে, বিশেষতঃ খাদ্যশস্য আমদানির বেলায়। এটা আমদানি কাঠামোস্থ অন্যান্য পণ্য শ্রেণীর স্বাভাবিক বিবর্তন প্রভাবিত করে। এ অসুবিধাটি মেনে নেয়ার পর সার্বিক আমদানি কাঠামোর উপর নিম্নোক্ত মন্তব্য করা যায়। গত ছয় বছরের বিবর্তনে আমদানি কাঠামোয় খাদ্য ও পানীয়ের এবং বিশেষ করে শিল্পজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল (সুতা, কাপড়, সিমেন্ট, সার)–এর প্রাধান্য বেড়েছে। ভোগ্যপণ্যের (কেবলমাত্র টেকসই, আধা–টেকসই ও অস্থায়ী প্রকৃতির) অবস্থান মোটামুটি স্থিতিশীল। যন্ত্রপাতি, জ্বালানী ও লুব্রিকান্ট এবং পরিবহণ সরঞ্জামাদির বিবর্তনের ধারা নিম্নমুখী।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre

আমদানি কাঠামোর এরূপ বিবর্তনের কারণ বহুবিধ। খরা, দুর্যোগসহ বহুবিধ কারণে খাদ্যশস্যের আমদানি মাঝে মাঝে বেশ বেড়ে যায়। যার ফলে আমদানি কাঠামোয় খাদ্য ও পানীয়ের একটা অনিয়মিত উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হয়। তবে সূতা, কাপড়সহ অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল আমদানি, আমদানি কাঠামোয় ইদানিং প্রভাব বিস্তারের কারণ তৈরী পোশাক শিল্পের উপর থেকে কোটা প্রথা অপসারনোত্তর এর পুনঃ বিকাশ। মূলধনী যন্ত্রপাতির অবদান কিছুটা কমে যাওয়ার একটা ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, শুরুতে তৈরী পোশাক শিল্পের জন্য যে সব কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আনা হয়েছিল পরবর্তীকালে ঐগুলোর পূর্ণ কর্মক্ষমতা ব্যবহার জনিত কারণে পরবর্তীতে সরঞ্জাম ক্রয় কমে যায়। দ্বিতীয়তঃ ৮০-র দশকের শুরুর বছরগুলোতে কৃষিখাতে যেভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি (পাম্প ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছিলো পরবর্তীতে তার হার কমে আসে। আমদানি কাঠামোয় মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপকরণ (কাঁচামাল, খুচরা যন্ত্রাংশ ইত্যাদি)-এর অবদান উত্তরোত্তর বাড়ার কারণ লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ ও কাগজ জাত দ্রব্য এবং রসায়ন শিল্পসহ অন্যান্য প্রধান প্রধান শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত চার বছর থেকে এসব শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে।

সারণী -১০

বাংলাদেশের আমদানি কাঠামো (পরিবর্ধিত)

(শতকরা হারে)

	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮
খাদ্য ও পানীয়	২৩	২৩	২৯	২০	২৪	২৮
শিল্পজাত	৩০	৩৮	৩৬	৩৯	৩৮	৩৮
জ্বালানী ও লুব্রিকান্ট	২৩	২০	১৬	১৯	১৫	১৪
কলকব্জা ও মূলধনী যন্ত্রপাতি	১৫	১৩	১১	১৩	১৪	১২
পরিবহণ যন্ত্রাংশ	৭	৪	৫	৫	৬	৫
ভোগ্যপণ্য	২	৩	৩	৩	৩	৩
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিবেশিত উপাত্তের রূপান্তরিত রূপ, ১৯৮৮-৮৯।

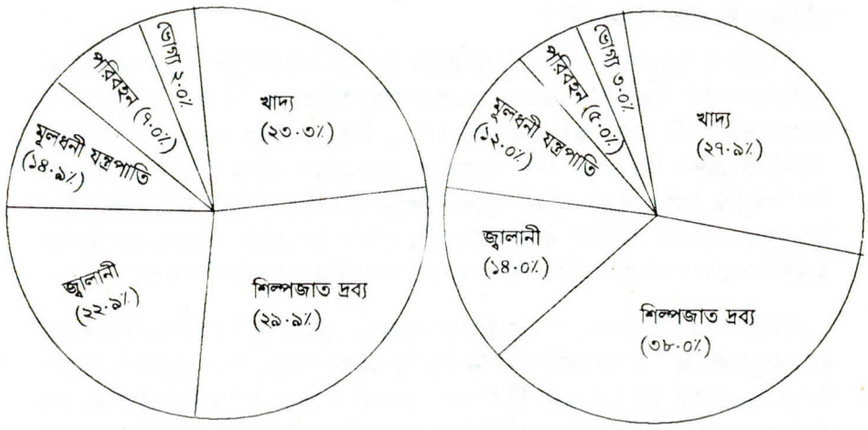

(গ) ১৯৭৯–৮০ (ঘ) ১৯৮৭–৮৮

চিত্র–২ ঃ বাংলাদেশের আমদানি কাঠামো

রপ্তানি বাণিজ্যের ন্যায় আমদানি বাণিজ্যেও বেসরকারী খাত মূখ্য ভূমিকায় চলে আস্‌ছে ক্রমাগত। ১৯৮২–৮৩ সালে সরকার দেশের মোট আমদানির ৩৭% নিয়ন্ত্রন করতো। ১৯৮৭–৮৮ অর্থ বছরে এই হার ১৩ ভাগে নেমে এসেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানিও একই সময়ে ২৯% থেকে হ্রাস পেয়ে ৭% –এ এসে দাঁড়ায়। অপরদিকে বেসরকারী খাতের আমদানি ১৯৮২–৮৩ সালের ৩২% থেকে ১৯৮৭–৮৮ সালে মোট আমদানি ব্যয়ের ৭৯%–এ এসে দাঁড়িয়েছে। (সারণী–১১ দ্রষ্টব্য)।

সারণী–১১

প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে আমদানি

(শতকরা হার)

	১৯৮২–৮৩	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮
সরকার	৩৭	২৬	৩৬	৯	১৪	১৩
জাতীয় শিল্প	২৯	২৫	১০	১৫	১৩	৭
টি, সি, বি	১	১	০	১	০	০
ব্যক্তিগত	৩২	৪৮	৫৩	৭৫	৭২	৭৯
অন্যান্য	০	০	০	০	০	০
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিবেশিত উপাত্ত থেকে রূপান্তরিত, ১৯৮৮–৮৯।

বাণিজ্যের সামগ্রিক গতিপ্রকৃতি ঃ

এ পর্যন্ত বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি পরিস্থিতি এবং আমদানি রপ্তানির ধারা ও কাঠামোগত পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাকালে বাণিজ্য ঘাটতির প্রবৃদ্ধি হার, আমদানি রপ্তানির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরণের আলোচনায় কেবলমাত্র পরিস্থিতির আংশিক চিত্রই প্রকাশ পায়। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও একটা বিশেষ দিক উন্মোচিত হতে পারে যদি আমরা আমদানি–রপ্তানি ও বাণিজ্য ঘাটতিকে অভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনের প্রেক্ষিতে আলোচনা করি। অভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত/হার হিসেবে আমদানি–রপ্তানি ও বাণিজ্য ঘাটতির বিবর্তন বাণিজ্য পরিস্থিতির নতুন দিক নির্দেশ করে।

অভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসেবে আমদানি–রপ্তানিকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে। এক, অভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনে আমদানি–রপ্তানির অবদান কতটুকু অর্থাৎ অভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কত ভাগ আমদানি ও রপ্তানি দখল করে আছে। এটা স্বভাবতঃই একটা দেশ কতটা শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর তার নির্ণায়ক। পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনে তার আমদানি–রপ্তানি অবদান খুবই সামান্য। ১৯৮৭–৮৮ সালে আমদানি ও রপ্তানির অবদান যথাক্রমে মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদনের মাত্র ১৪·৯% ও ৬·৯% ছিল। পাকিস্তানে এ হার ১৮·৪% ও ১৩·২% এবং ভারতে ৮·৬% ও ৫·৭%। অবশ্য ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি বিকাশের পক্ষপাতি কিন্তু অন্যান্য দেশ বৈদেশিক বাজারের উপর অধিকতর নির্ভরশীল।

গত দশকে রপ্তানি জিডিপি অনুপাত যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনি হ্রাস পেয়েছে আমদানি জিডিপি অনুপাত। রপ্তানি ক্ষেত্রে ১৯৮০–৮১ অর্থ বছরে রপ্তানি জিডিপি অনুপাত ছিল ৬·৬%। গত ৮ বছরে তা কমে ১৯৮৭–৮৮ অর্থ বছরে হয়েছে ৬·১%। একই সময়ে আমদানি জিডিপি অনুপাত ২১·৯% থেকে কমে ১৪·৯% হয়েছে। (সারণী –১২ দ্রষ্টব্য)।

সারণী —১২

দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোগত পরিবর্তন

	অনুপাত ১৯৮১		অনুপাত ১৯৮৭	
	রপ্তানি জিডিপি (%)	আমদানি জিডিপি (%)	রপ্তানি জিডিপি (%)	আমদানি জিডিপি (%)
বাংলাদেশ	৬·৬	২১·৮	৬·১	১৪·৯
ভারত	৫·৭	১০·৬	৫·৭	৮·৬
পাকিস্তান	১১·৪	২১·২	১৩·২	১৮·৪
শ্রীলংকা	২৫·১	৪৩·৮	২৩·১	৩৪·৫
ইন্দোনেশিয়া	২৬·২	১৫·৬	২৪·৭	২০·৭

উৎস ঃ *ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট* ১৯৮৩ ও ১৯৮৯–এর ভিত্তিতে রূপান্তরিত

উপরোক্ত বিশ্লেষণে এটা পরিস্কার যে, গত দশকে জিডিপি-তে অবদান বিচারে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিস্থিতির কোন অনুকূল পরিবর্তন সাধিত হয় নাই, বরং জিডিপি-তে রপ্তানি ও আমদানি অবদানের হ্রাস দেশের উন্নয়ন বিচারে নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক। তবে বাংলাদেশের ভারসাম্যহীন বাণিজ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে রপ্তানির তুলনায় আমদানির অবদান হ্রাস কিছুটা অর্থবহ। অন্ততঃ অর্থনীতির বৈদেশিক খাতের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসে। বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতির একটা বিশেষ দিক হলো রপ্তানির তুলনায় আমদানি প্রবৃদ্ধির হার কমিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা, যাতে দেশের চলতি হিসেবের ঘাটতি পরিস্থিতির উন্নতি হয়। এ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ অনেকটাই সফল হয়েছে যা বাংলাদেশের চলতি হিসেবের ঘাটতি-জিডিপি অনুপাত থেকে বুঝা যায় (সারণী - ১৫ দ্রষ্টব্য)। উক্ত অনুপাত ১৯৮০-৮১ এর -১০.০% থেকে হ্রাস ১৯৮৭-৮৮ অর্থবছরে -৫.৭% হয়েছে।[১]

কিন্তু এই উন্নতি মূলতঃ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার জোরদার এবং আমদানি প্রবৃদ্ধি হার শ্লথতর করার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমদানি প্রবৃদ্ধি হার হ্রাস পাওয়া সব সময়ই যে আকাঙ্খিত এমন নয়, বিশেষ করে তা যদি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্য আমদানির বেলায় হয়।

আমদানি কাঠামো বিশ্লেষণের সময় আমরা দেখেছি আমদানি কাঠামোয় ভোগ্যপণ্যের প্রভাব বেড়েছে। অপরপক্ষে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির অংশ কমে গেছে। এটা অর্থনীতির ভবিষ্যতের জন্য সুখকর নয়।

সুতরাং বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতির ফলপ্রসূতা তখনই প্রমানিত হবে যদি বর্তমান বাণিজ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানির প্রবৃদ্ধি হার শ্লথতর করা হয় এবং তা উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় পণ্য আমদানি কমানোর মাধ্যমে নয় বরং ভোগ্যপণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। তাই এ প্রসঙ্গে সুপারিশ হলো ; এক, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার আরও ত্বরান্বিত করতে হবে এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। সেটা কিভাবে সম্ভব এজন্য অবশ্য ভিন্ন একটা গবেষণা কর্ম হাতে নেয়ার প্রয়োজন পড়বে। দ্বিতীয়ত ঃ আমদানিকে অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে ভোগ্য পণ্য আমদানির পরিমান কমানো যায় এবং আমদানি কাঠামোতে এর প্রভাব একটা যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত কমানো যায়। তৃতীয়তঃ পাশাপাশি উৎপাদন সচল ও গতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির উপর যাতে কোন চাপ না পড়ে সেদিকে নজর রাখা আমদানি নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করতে হবে।

---

[১] বিশ্ব ব্যাংক ঃ বাংলাদেশ রিসেন্ট ইকনমিক ডেভেলপমেন্টস্ এণ্ড সর্ট টার্ম প্রস্পেক্টস, মার্চ ১৩,১৯৮৯।

বাণিজ্য কাঠামো ও বাণিজ্য নীতি

৮০-র দশকে বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামোতে কি পরিবর্তন এসেছে? এ সময়ে অনুসৃত বাণিজ্য নীতির সাথে উক্ত পরিবর্তনের সাযুজ্য কি? এ প্রশ্নগুলোর আলোচনা এ পর্যায়ে যুক্তিসঙ্গত। এর আলোচনা প্রয়োজন। ১৯৮০-৮১ থেকে বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামো দশকের শেষ পাদে নিম্নরূপ পরিগ্রহ করেছে ঃ

(ক) রপ্তানি কাঠামোতে প্রচলিত পণ্যের অবদান বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে, পক্ষান্তরে পোশাক, হিমায়িত খাদ্যের ন্যায় অপ্রচলিত পণ্যের অবদান বেড়েছে। তবে পোশাক শিল্প রপ্তানির অগ্রগতির সিংহভাগই বিদেশী কাপড় আমদানি নির্ভর। (খ) রপ্তানি বাণিজ্যের কাঠামোগত পরিবর্তনের দ্বিতীয় দিক হলো রপ্তানিকারকদের শ্রেণীগত অবস্থানের পরিবর্তন। আগে সরকার ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পই বাংলাদেশের রপ্তানি সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো, এখন সেটা করছে বেসরকারী খাত। (গ) বাংলাদেশের আমদানি কাঠামোতে ভোগ্যপণ্যের প্রাধান্য বেড়েছে আর মূলধনী যন্ত্রপাতির অবদান হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য মূলধন যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপকরণের আমদানি বেড়েছে। (ঘ) আমদানির বেলায়ও সরকার ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের প্রাধান্য বিপুলভাবে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে বেসরকারী খাতের ভূমিকা নেতৃস্থানীয় হয়েছে। (ঙ) আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসেবে, যেখানে বৈদেশিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমদানি বৃদ্ধির হার থেকে রপ্তানি বৃদ্ধির হার দ্রুততর হওয়ার কারণে বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধির হার শ্লথ হয়েছে। যার ফলে বাণিজ্য ঘাটতি জিডিপি অনুপাত দর্শনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, বাণিজ্য ঘাটতি পরিস্থিতির কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছে আশির দশকের শেষ প্রান্তে।

এখন বিবেচনার বিষয়, উপরোক্ত কাঠামোগত পরিবর্তন কতটা ৮০-এর দশকে অনুসৃত নীতিমালার অনুবর্তী হয়েছে।

রপ্তানি নীতি

৮০-র দশকে রপ্তানি নীতির (সারণী-১৩) অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমদানি আয় বৃদ্ধির হার অধিককরণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভারসাম্য আনয়ণ। দ্বিতীয় আর একটা লক্ষ্য সাধারনভাবে সব বছরের নীতিতে অন্তর্ভূক্ত ছিল সেটা হলো, রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন, সরলীকরন ও রপ্তানি পদ্ধতি সহজীকরন। বাণিজ্য নীতির এ দু'টো সাধারন লক্ষ্য ছাড়াও দশকের প্রথমার্ধে যে ক'টা আনুষাঙ্গিক নীতি গ্রহণ করা হয় তার লক্ষ্য ছিল বর্হিবিশ্বে, নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি, পণ্য সরবরাহ উন্নয়ন ও পণ্য বাজার বহুমুখীকরণ এবং রপ্তানির অবকাঠামো সৃষ্টি। পক্ষান্তরে দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সব নীতিগুলো অন্যতম প্রধান আনুষাঙ্গিক লক্ষ্য হিসেবে রপ্তানি নীতিতে আসে তাহলো, নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি তালিকায় অন্তর্ভূক্তি ও রপ্তানি ভিত্তি সুদৃঢ় ও বহুমুখীকরণ, প্রচলিত পণ্যের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর রপ্তানি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি এবং অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনকল্পে পশ্চাৎ সংযোগ স্থাপনে উৎসাহ প্রদান।

সারণী - ১৩
রপ্তানি নীতি ১৯৮০-৮৯

	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯
১। আমদানি ব্যয় অপেক্ষা রপ্তানি আয় বৃদ্ধির হার অধিককরণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভারসাম্য আনয়ন	√			√	√		√	√	√
২। নূতন নূতন পণ্য রপ্তানি তালিকায় অন্তর্ভূক্তি ও রপ্তানি ভিত্তি সুদৃঢ় ও বহুমুখী করণ			√				√	√	√
৩। অধিকমূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনকল্পে পশ্চাৎ সংযোগ স্থাপনে উৎসাহ প্রদান							√	√	√
৪। নতুন বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ	√	√						√	√
৫। রপ্তানি সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন সরলীকরণ ও রপ্তানি পদ্ধতি সহজীকরণ	√	√	√	√	√		√	√	√
৬। সম্ভাবনাময় পণ্যের উন্নয়নের জন্য ৪ বৎসর মেয়াদী ক্রাস প্রগ্রাম									
৭। সার্বিক রপ্তানি আয়ে অপ্রচলিত ও পাটজাত দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি আয়ের অংশ যথাযথভাবে বৃদ্ধি				√	√				
৮। পণ্য সরবরাহ উন্নয়ন ও পণ্য বাজার বহুমুখীকরণ		√	√	√					
৯। রপ্তানির অবকাঠামো সৃষ্টি		√	√						
১০। প্রচলিত পণ্যের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর রপ্তানি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি	√						√	√	√

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত।

আমদানি নীতি

অপরপক্ষে, আমদানি নীতির (সারণী -১৪) লক্ষ্য হিসেবে যেটি প্রায় প্রতি বছরই বাণিজ্য নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত ছিল তাহলো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা ও কল-কারখানার কাঁচামাল যোগান দেয়া। আরো একটা অতি জোরালোভাবে উচ্চারিত লক্ষ্য যা ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে আমদানি নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত হয় তাহলো, আমদানি নীতিকে রপ্তানি উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ। তাছাড়া দেশীয় কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার, পণ্যের মানোন্নয়ন এবং আমদানি নিয়ম নীতি সহজ ও নিয়ন্ত্রনমুক্ত করা ইত্যাদি লক্ষ্যও একই সময়ে গৃহীত হয়। স্থানীয় শিল্প সংরক্ষণকল্পে আমদানি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে কোন কোন পণ্যের উপর।

সারণী - ১৪

আমদানি নীতি ১৯৮০-৮৯

	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯
১। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা ও কলকারখানার কাঁচামাল যোগান দেয়া	√	√	√	√		√	√	√	√
২। ও জিএল বা লাইসেন্সের আওতায় আমদানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি	√								
৩। নতুন আমদানিকারক অন্তর্ভূক্তি	√	√				√	√	√	
৪। বেসরকারীখাতে সিমেন্ট আমদানি	√								
৫। ওয়েজ আর্নার স্কীম এবং এজন্য তালিকা সম্প্রসারিত করণ	√	√	√						
৬। নতুন বিদেশী প্রযুক্তির আমদানি									√
৭। রপ্তানি মুখী শিল্পস্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ	√								
৮। রপ্তানি কাঁচামালের উদার আমদানি	√								
৯। স্থানীয় শিল্প সংরক্ষণকল্পে আমদানি নিষেধাজ্ঞা		√	√		√				
১০। রপ্তানি উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে আমদানি নীতি				√	√	√	√	√	√
১১। রপ্তানি বৃদ্ধি ও দেশে প্রস্তুত পণ্যের আমদানি হ্রাস			√						
১২। লাইসেন্স অব্যবহারকারীদের লাইসেন্স বাতিল		√	√						
১৩। শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচীর সহিত আমদানি নীতির সমন্বয় সাধন									√
১৪। আমদানি কর্মসূচীর জন্য প্রধানত: নগদ অর্থ ও ওয়েজ আর্নার স্কীমের উপর নির্ভরতা					√				
১৫। বরাদ্দকৃত অর্থের কাঠামো সরকারী/বেসরকারী									
১৬। দেশীয় কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার				√	√	√	√	√	√
১৭। দেশীয় কারখানার দক্ষতা বৃদ্ধি ও পণ্যের মানোন্নয়ন					√	√	√	√	
১৮। আমদানির নিয়ম পদ্ধতি সহজ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা/ উদার আমদানি				√	√	√	√	√	√

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত।

আমদানি ও রপ্তানি নীতির লক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতির কয়েকটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। এক, বাণিজ্য ঘাটতি তথা বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উন্নয়নের জন্য কেবল রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার জোরদার করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমদানি নীতির কোন লক্ষ্যই দেশের লেনদেন পরিস্থিতির উন্নয়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। অর্থাৎ আমদানি বৃদ্ধি হারের চাইতে রপ্তানি বৃদ্ধি হার জোরদার হলে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উপর অনুকূল প্রভাব পড়বে এটাই ধরে নেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাণিজ্য ঘাটতির কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে গত চার বছরে এবং সেটা অর্জিত হয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধি হার দ্রুততর এবং আমদানি বৃদ্ধি হার শ্লথতর হওয়ার মাধ্যমে। জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে বাণিজ্য ঘাটতির হার কিছুটা হ্রাসের দ্বারা উক্ত প্রবনতা সুস্পষ্ট (সারণী –১৫)। এই আমদানি বৃদ্ধি হার শ্লথতর হওয়া ঘোষিত বাণিজ্য নীতির বহির্ভূত কোন নীতি, বিশেষত মুদ্রার অবমূল্যায়ন নীতির ফল।

সারণী– ১৫

বাণিজ্য ঘাটতি জিডিপি অনুপাত

	১৯৮০–৮১	১৯৮১–৮২	১৯৮২–৮৩	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮
বাণিজ্য ঘাটতি/ জিডিপি	৯	৯	৯	৯	১০	৮	৬	৯

উৎস ঃ বাণিজ্য বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

দুই, আমদানি নীতিকে রপ্তানি উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ আমদানির প্রভাব আমদানি কাঠামোয় সুস্পষ্ট। এমতাবস্থায় আমদানি নীতি পরোক্ষভাবে হলেও রপ্তানি উন্নয়নে অবদান রেখে বাণিজ্য ঘাটতি সীমিতকরনে সহায়তা করেছে।

তিন, স্থানীয়, শিল্পের সংরক্ষণকল্পে আমদানি নিষেধাজ্ঞা, দেশীয় কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার, দেশীয় কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন ইত্যাদি লক্ষ্যসমূহ আমদানি নীতিতে যে দেশীয় শিল্পের পরিপোষণের পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবে এ সব নীতির বাস্তবায়ন ফলপ্রসূভাবে হয়নি বিধায় ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প ও বস্ত্র শিল্প বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় মারাত্মক হুমকি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ৮০–র দশকের শেষার্ধে শিল্পোৎপাদন পরিস্থিতির অবনতি এর প্রমান।* আমদানি কাঠামোতে মূলধনী যন্ত্রপাতির প্রভাব হ্রাস এবং ভোগ্যপণ্যের উত্তরোত্তর বর্ধিত প্রভাব তাই ৮০–র দশকে অনুসৃত আমদানি নীতির অনুবর্তী নয়।

* বিশ্বব্যাংক ঃ বাংলাদেশ রিসেন্ট ইকনমিক ডেভেলপমেন্টস এণ্ড সর্টটার্ম প্রসপেক্টস, মার্চ ১৩, ১৯৮৯।

চার, রপ্তানি কাঠামোতে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের প্রভাব বৃদ্ধি রপ্তানি নীতির অনুবর্তীর পরিচায়ক। তবে প্রচলিত পণ্যের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি সংক্রান্ত রপ্তানি নীতির লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়নি যা রপ্তানি কাঠামোয় সুস্পষ্ট।

পাঁচ, গত দশকে রপ্তানি কাঠামোয় অপ্রচলিত পণ্যের অবদান বৃদ্ধি ও অপ্রচলিত পণ্যের সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যাপারটি রপ্তানি লক্ষ্যের অনুবর্তী। তবে রপ্তানি কাঠামোতে অপ্রচলিত পণ্যের প্রাধান্য বৃদ্ধি মূলত ঃ পোশাক শিল্পের একক প্রাধান্যের কারণে। পোশাক শিল্প ও হিমায়িত খাদ্য বাদে অপ্রচলিত অন্যান্য পণ্যের প্রভাব রপ্তানি কাঠামোতে দশকের প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে ম্রিয়মান (সারণী-৭)।

ছয়, আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই বেসরকারী খাতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সরকারের পর্যায়ক্রমে মুক্ত বাণিজ্যনীতি অনুসরণের ফলশ্রুতি। এ নীতি রপ্তানি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

৩. *দক্ষতা বিবেচনায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অগ্রগতি*

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের দক্ষতার প্রশ্নটি তার বাণিজ্য ঘাটতি পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং এ প্রক্রিয়ায় দেশের বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে আনার সাথে যেমন জড়িত তেমনি আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে দেশের জন্য শিল্পায়ন সহায়ক বাণিজ্য নীতির সাথে সম্পর্কিত। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি বাণিজ্য-ঘাটতি নিরসনের মাধ্যমে কতটা বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমানোর পথে অবদান রাখতে পেরেছে সেটা যেমন বিবেচ্য, তেমনি তা প্রকৃতপক্ষে দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় কতটা অবদান রাখতে পেরেছে সেটাও মূল্যায়ন করে দেখার ব্যাপার।

ইতোপূর্বে আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি বাণিজ্য ঘাটতি পরিস্থিতির মৌলিক কোন উন্নতি সাধন করতে পারেনি। এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে তা হলো বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উত্তরোত্তর নাজুকতার গতি কিছুটা স্তিমিত হয়েছে। ফলে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস পায়নি। মাথাপিছু বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধির হার থেকে তা স্পষ্ট (সারণী-১৬ দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতিতে দেশীয় শিল্পের বিকাশের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা কার্যকরী হয়নি গত দশকে। ৭০-এর দশকের তুলনায় ৮০-র দশকের গড় শিল্পোৎপাদন প্রবৃদ্ধি হার হ্রাস পেয়েছে। ৮০-র দশকের শেষ পাদে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হার ঋণাত্মক। (সারণী-১৭ দ্রষ্টব্য)।

ঐতিহ্যবাহী পাট শিল্পের সম্ভাবনা অপসৃয়মান। বয়ন শিল্পের অবস্থাও তথৈবচ। ৭ লক্ষ ২ হাজারের মধ্যে এ শিল্পের ৭৫% তাঁত অচল বর্তমানে। *

উপরোক্ত বিশ্লেষণে এটাই দাঁড়ায় যে, দক্ষতা বিবেচনায় বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতি তেমন একটা ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত নয়, না বাণিজ্যিক ভারসাম্য উন্নয়নে, না শিল্পায়ন প্রচেষ্টায়।

---

* সম্পাদকীয়, *বাংলাদেশ অবজার্ভার*, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯০।

সারণী – ১৬

বৈদেশিক ঋণ পরিস্থিতি

বছর	বকেয়া ঋণ (মিলিয়ন ডলার)	জনপ্রতি বকেয়া ঋণ (ডলার)
১৯৮৫	৫৯৭৮	৬০·২৬
১৯৮৬	৭২৯২	৭১·৫০
১৯৮৭	৮৮৫১	৮৫·০২
১৯৮৮	৯৫৬৪	৮৯·৭১

উৎস ঃ বিশ্বব্যাংক : বাংলাদেশ রিসেন্ট ইকনমিক ডেভেলপমেন্টস এণ্ড শর্ট টার্ম প্রসপেকটস্, মার্চ ১৩, ১৯৮৯।

সারণী–১৭

খাতওয়ারী জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি (১৯৭৩-৮৮)

(বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার, ১৯৭৩–এর স্থিরমূল্যে)

						জিডিপির অংশ হিসেবে	
	১৯৭৩–৮০	১৯৮১–৮৬	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮	১৯৮০–৮১	১৯৮৭–৮৮
কৃষি	৩·৫	২·৯	৪·০	০·১	–১·১	৪৮·৭	৪৩·৪
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৩·৯	৩·০	১·৮	৬·৪	–০·৭	১০·১	৯·৮
নির্মাণ ও উপযোগ	৭·৪	৯·৮	৩·০	৮·৬	১৪·৩	৪·৩	৬·৬
সেবা	৭·৬	৫·১	৬·৬	৭·৪	৩·৭	৩৬·৪	৪০·২

উৎস্য ঃ বিশ্বব্যাংক ঃ বাংলাদেশ রিসেন্ট ইকনমিক ডেভেলপমেন্টস্ এণ্ড শর্ট টার্ম প্রসপেক্টস্, মার্চ ১৩, ১৯৮৯।

উপসংহার

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক খাত অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় তার নিজস্ব অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের নীরিখে আমাদানি ও রপ্তানির অনুপাত হ্রাসের মধ্য দিয়ে এ সত্য প্রতিভাত। তাই আমদানির চাইতে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হার জোরদার–এরূপ কথা বলে আত্মতুষ্টি লাভের কোন অবকাশ নেই। তবে যেভাবেই হোক বাণিজ্য ঘাটতির প্রবৃদ্ধি হার শ্লথতর হয়ে আসা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটা তাৎপর্যবহ অবস্থা নির্দেশ করে। এটা কতটা সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের ফলশ্রুতি–সে ব্যাপারে জোর করে কিছু বলা না গেলেও অন্ততঃ এতটুকু বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য খুব একটা সুখকর নয়।

বাংলাদেশের আমদানি ও রাপ্তানি কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে। রপ্তানি কাঠামোর অপ্রচলিত পণ্যের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেটা মূলতঃ বিদেশী কোটা ও ১০০% কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি-নির্ভর। ফলে এতে মূল্য সংযোজন যৎসামান্য। আমদানি কাঠামোয় ভোগ্যপণ্যের প্রাধান্য সুস্পষ্ট, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি হ্রাস পেয়েছে আমদানির বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠা ছাড়াই। অপরদিকে শিল্পোৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হার শ্লথতর এবং দশকের শেষের দিকে ঋণাত্মক। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি কেবলমাত্র রপ্তানি হার বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশে তেমন কোন ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেনি।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। বিশ্বব্যাংক ঃ *বাংলাদেশ রিসেন্ট ইকনমিক ডেভেলপমেন্টস্ এণ্ড শর্ট টার্ম প্রস্‌পেক্টস্,* মার্চ ১৩, ১৯৮৯, এশিয়া কাণ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট-১।

২। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ,* ১৯৮৮-৮৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩। এ, রব ঃ "এক্সপোর্ট পারফরমেন্স এণ্ড প্রসপেক্টস্ এণ্ড গভর্ণমেন্ট পলিসি টু প্রমোট এক্সপোর্টস ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধ, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি ১৯৮৮-তে প্রকাশিত।

৪। এ, আর, ভূঁইয়া ঃ *"এন এক্সপোর্ট পলিসি ফর বাংলাদেশ"* শীর্ষক প্রবন্ধ, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি-১৯৮৮-তে প্রকাশিত।

৫। রিচার্ড ডি, ম্যালন ঃ *"ইমপোর্ট প্রবলেমস্ এণ্ড পলিসি ফর বাংলাদেশ"* শীর্ষক প্রবন্ধ, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি-১৯৮৮ -তে প্রকাশিত।

৬। আবুল কালাম আজাদ ঃ *"সেকটরাল লিংকেজ, ডেভেলপমেন্ট ষ্ট্রেটেজি এণ্ড ট্রেড প্যার্টান অব বাংলাদেশ"* শীর্ষক প্রবন্ধ, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি ১৯৮৮-তে প্রকাশিত।